একক ৩ ❑ গদ্যের শৈলী

৩.১ গদ্যকে কীভাবে দেখেছি

৩.২ যুক্তির গদ্য, সৃষ্টির গদ্য

৩.৩ গদ্যশৈলীবিচার ও শৈলীবিজ্ঞান

৩.৪ ভাষাদর্শ (নর্ম) এবং সরে-আসা (ডেভিয়েশন)

৩.৫ ভাষার পরিবর্তক (ভ্যারিয়ান্ট) এবং উপলক্ষ্য (কনটেক্সট)

৩.৬ গদ্যের শৈলীবিচারের মানক

৩.৭ উদাহরণমালা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা'

৩.১ ❑ গদ্যকে কীভাবে দেখেছি

কবিতার শৈলী নিয়ে আলোচনার পর আমরা গদ্যের শৈলীর দিকে তাকাতে পারি। গদ্যভাষা নিয়ে লেখাপত্র খুব জরুরি। কেননা বাংলা গদ্য নিয়ে আলোচনা খুব কম। কবিতা নিয়ে ভাবলে যেমন হাজারটা অনুভূতির দরজা খুলে যায়, তেমনি গদ্যশৈলীকে দেখলে বোধের বন্ধ দরজাটা খোলে। লেখকের মানসিক কর্মশালার আরেক কাজের ধরন জানতে পারি।

সাধারণভাবে একাল অবধি চলে আসা অলংকারশাস্ত্রে গদ্যের শৈলীভাগ স্বীকার করা হয়—উঁচু (মহান), মাঝারি (মধ্যম), নীচু (সাধারণ)। আরিস্টটল তাঁর রিটোরিকসে একে বলেছেন—গ্রেড, মিডল, লো স্টাইল। এ প্রসঙ্গে পূর্ব-আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, কোথাও কোথাও তিনটি মিলে যাচ্ছে এবং একটি অপরটিতে আরোহ-অবরোহ করছে—এই জটিল প্রশ্নের সমাধান সমালোচকের চোখের বাইরে থেকেছে।

গদ্যশৈলীর আলোচনায় আবার যুগ্ম-বৈপরীত্য (বাইনারি অপোজিশন) ধারণা ব্যবহার করি। যেমন, এম. এইচ. আব্রামস বলেছিলেন পর্যাবৃত্ত (পিরিওডিক)-অপর্যাবৃত্ত (নন-পিরিওডিক) অথবা সংযোজকঅব্যয়হীন (প্যারাট্যাক্সিস)-সংযোজক অব্যয়যুক্ত (হাইপোট্যাক্সিস) বাক্যের কথা। 'পর্যাবৃত্ত' বলতে বাক্যের শেষে ভাবনার ছেদ, বক্তৃতার ঢং বা নিয়মবাঁধা রূপ ভাবা হয়েছে। আর 'অপর্যাবৃত্তে' শৈলী এলায়িত (লুজ বা রিলাক্সড), সংলাপ-ঘেঁষা। একই বাক্যে অনেক উপবাক্য কিংবা নিরপেক্ষ সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত বাক্যমালাকে বলা হয়েছে 'প্যারাট্যাক্সিস'। আবার অব্যয়যুক্ত বাক্যের গড়ন অনেকটা পর্যাবৃত্তের মতো—জাগতিক যুক্তির সম্পর্কে বাঁধা। 'যখন....তখন, কারণ, সুতরাং, জন্যে, ফলে'—অধিবাক্যাংশ (ফ্রেজ) বা উপবাক্যাংশ (ক্লজ)-এর সাহায্যে গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অপর্যাবৃত্ত বা সংযোজক অব্যয়হীন বাক্য হল সরল বাক্য। আর পর্যাবত্ত বা অব্যয়যুক্ত বাক্য হল জটিল বাক্যের নামান্তর একটু ভিন্নমাত্রাসহ। নর্থ্রপ ফ্রাই তাঁর 'দা ওয়েল-টেম্পারড ক্রিটিক' (১৯৬৪) বইয়ে এই

শৈলীবিভাজন করেছেন লৌকিক (ডেমোটিক) এবং শিষ্ট (হায়ারাটিক) নামে। 'লৌকিক' হল সাধারণ মানুষের ভাষা, ছন্দস্পন্দ ও অনুষঙ্গাজাত আর 'শিষ্ট' হল নিয়মে-বাঁধা বিশদীকরণ যা সাধারণ ভাষা থেকে আলাদা। দুটিরই আবার উঁচু-নীচু-মাঝারি ভেদ আছে। লক্ষ করার মতো যে, আব্রামসের বক্তব্যের ভিত হল বাক্যের গড়ন আর ফ্রাইয়ের চলতি ও সাহিত্যিক ভাষাভেদের ধারণা। এ ধরনের যুগ্ম বৈপরীত্যবাদ গদ্যশৈলী বিশ্লেষণকে কঠিন করে।

অন্যদিকে গদ্য আলোচনায় আমরা কয়েকটি 'লেবেলিং' লক্ষ করি। যেমন,

১. প্রচল শৈলীধারণা : খাঁটি, অলংকৃত, সাজানো, কৃত্রিম, সহজ, সরল, বিশদ

২. সাহিত্যপর্যায় বা প্রথা : ফোর্ট উইলিয়মের গদ্য, তৎসমপ্রধান গদ্যশৈলী

৩. প্রভাবজাত রূপ : মহাকাব্যিক শৈলী

৪. প্রায়োগিক : বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিকসুলভ

৫. বিশেষত্ববোধক : রাবীন্দ্রিক, বঙ্কিমী, প্রমথীয়

এই লেবেলগুলো আমাদের সমালোচনার সুবিধার জন্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিচার নিরপেক্ষ নয়। যেমন, 'খাঁটি' বিশেষণটি ভাববাদী আবার 'সরল' বললে অতিভাষণ হয়। কেননা সরল লেখা কঠিন। আর অতিসরল লেখা ছাত্রপাঠ্য বস্তু। অন্যান্য বিভাগগুলো যুগপ্রভাব, অতীত প্রভাব, বিষয়ানুসারিতা কিংবা লেখকের বিশেষত্বকে প্রকাশ করেছে। তবে গদ্যশৈলী বিচারে প্রথমটি বাদ দিলে বাকি কটির গ্রহণযোগ্যতা আছে।

৩.২ ❑ যুক্তির গদ্য, সৃষ্টি গদ্য

আবার গদ্য যেহেতু পদ্যের বিপরীত, তাই যা কিছু পদ্য নয়, তাকেই গদ্য আখ্যা দিই। ফলে গদ্যের আওতায় পড়ে প্রবন্ধ, লিখিত ভাষণ, চিঠি, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। গদ্যের যে দুটি রূপ আছে, একথা সমালোচনায় আমরা মেনে নিই না। ভাষায় যেমন জ্ঞানমূলক এবং সৃষ্টিমূলক দুটি দিক আছে, গদ্যেরও তাই। অভিধাটি মনে থাকে না বলে লেখকের যুক্তির গদ্য আর সৃষ্টির গদ্যের বৈশিষ্ট্য একইভাবে বিচার করি। যুক্তির গদ্যে প্রার্থিত হল—সংক্ষিপ্ততা, ভারসাম্য, নিয়মানুগত্য এবং বিষয়ানুবন্ধতা। অন্যদিকে সৃষ্টির গদ্যে যুক্তির গদ্যের গুণগুলিকে চরম বলে ধরা হয় না। আবার যুক্তির গদ্যেও সৃষ্টির স্থান আছে। কেননা একজন সচেতন সামাজিক মানুষই যুক্তির গদ্য লেখে। সৃষ্টির গদ্যে বিষয় শুধু জ্ঞানজগৎ নয়, মানবচরিত্র। কাজেই অনুভূতির দোলাচল আঁকতে গিয়ে লেখকরা যুক্তির সোপান, ব্যাকরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করেন। আমরা পাঠকরা তাই উপন্যাস, গল্প, নাটকে গদ্যের শরীর দেখি না—খুঁজি তার প্রতিক্রিয়াকে। কেননা রসিকের চিন্তা : সৃষ্টি গদ্য ভাবতে গেলে যদি সৃষ্টিটাই হারিয়ে যায়। অথচ প্রাবন্ধিকের গদ্যে যুক্তি-তর্কের শিকলি যেমন তার বোধ-বোধির ফল, তেমনি সৃষ্টির গদ্যেও ভালো করে লক্ষ করলে সাহিত্যিকের মনের খবর জানা যায়। সাহিত্যিক গদ্যকে নিজের প্রয়োজনে ভাঙচুর করেন, আর একান্ত যুক্তির গদ্যকার বন্ধন মেনেই নিজের বক্তব্যকে হাজির করেন।

কিন্তু দু স্থলেই মনের খোরাক থাকে। প্রথম স্থলে প্রিয় অনুভব বা মানবজীবন ব্যাখ্যার আনন্দ, আর দ্বিতীয় স্থলে থাকে জ্ঞানজগতে ভ্রমণের মাধুর্য বা প্রথম স্থলে পাওয়া আনন্দের ব্যাখ্যা (অর্থাৎ সাহিত্যসমালোচনা)। তবু যুক্তির গদ্য যতটা ধীরচারী, সৃষ্টির গদ্য তা নয়। এছাড়া ইতিহাস থেকে জানা যায়, যুক্তির গদ্য আগে জন্মেছে,

তারপর সৃষ্টির গদ্য। তাই যুক্তির ছকটা না জেনে সৃষ্টির খাতিরে গদ্যের চর্চা চলে না। তবে সৃষ্টির গদ্যের শৈলী বিচারে আমরা কৃতি-অতিরিক্ত (এক্সট্রা-টেক্সচুয়াল) বিষয় যতটা এনে ফেলি, যুক্তির গদ্যে তার সম্ভাবনা কম। একটি উপন্যাসের শৈলী বিচারে তার পরিবেশ, সমাজ তত্ত্ব, বিশেষ শ্রেণীচেতনা, অভিজ্ঞতা যতটা সক্রিয়, যুক্তির গদ্যে তার সুযোগ কম। কেননা যুক্তির গদ্য লেখা হয় কয়েকটি কারণকে কেন্দ্র করে—

১. নূতন তত্ত্বের উপস্থাপনা

২. বিজ্ঞান-বাণিজ্য বিষয় প্রচার

৩. নিজের জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা

৪. ইতিহাস, ভূগোলাদির পরিচয়

৫. কোনো সামাজিক বা অন্য বিতর্কের সৃষ্টি

৬. ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের অভাব

৭. ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি তাত্ত্বিক বিষয়ের জটিলতা ভঙ্গ

৮. মাতৃভাষার প্রকাশক্ষমতা পরীক্ষা

৯. সৃষ্টির গদ্যের ব্যাখ্যা

১০. সৃষ্টির গদ্যে প্রকাশের অযোগ্য বিষয়ের জন্য

এই দশটি কারণ এসেছে লেখকের মনের গড়ন, যুগের দাবি কিংবা সামাজিক উপযোগিতাকে নির্ভর করে। যুক্তি ও সৃষ্টি—গদ্যের এই দোরাস্তার প্রথমটির ইতিহাসক্রম জানতে পারি। সৃষ্টির গদ্য নিয়ে আমরা নীরবতা হিরণ্ময় মনে করি। অথচ দুটো রাস্তারই হদিশ যদি আমরা রাখতাম, তাহলে সাহিত্য-ভাষার পালাবদল ব্যাখ্যাত হতে পারত। সৃষ্টির গদ্যের অসংখ্য শিকড়মূল পরে ব্যাখ্যাত হবে বলে আপাতত আমরা যুক্তির গদ্যের শরীর নিয়ে আলোচনা সীমিত রাখব।

আব্রামস বা ফ্রাইয়ের মত অতি-সাধারণ। আবার গদ্যশৈলীর ব্যাখ্যায় পেটারের 'ইউনিক ওয়ার্ড থিওরী' বা মারীর 'ট্রু স্টাইল থিওরী' একেবারে রোমান্টিক। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে শৈলী খুঁজলে দণ্ডী বা কুন্তকের কথা মনে আসে। কিন্তু এদের দুজনের ধারণা শৈলীধারণার সঙ্গে একার্থক নয়। একালে আমরা যখন গদ্যশৈলী দেখি, তখন হয় ব্যাকরণ অঙ্গাগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই (বীপ্সা গণনা/ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টিং) কিংবা উপলক্ষ্য অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ (কনটেক্সট অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ) খুঁজি। কখনও মনে হয় গদ্যের ছন্দস্পন্দ যিনি বুঝেছেন, তিনি প্রকৃত গদ্যশৈলীকার (যেমন, বিদ্যাসাগর মূল্যায়ন)। গদ্যশৈলী বলতে শুধু অন্বয় বা পদগণনার কঠোরতা বা প্রসঙ্গ-ভাষার সমঝোতা বোঝায় না, আরও কিছু বোঝায়। যুক্তির গদ্যেও যে লেখকরা বিশেষ অন্বয়-কৌশল, নূতন শব্দের সৃষ্টি করেন এবং পুরাতন শব্দে নূতন মাত্রা আনেন অথবা প্রচল গদ্যপথ থেকে সরে আসেন, তাও বোঝায়।

আবার গদ্যশৈলী দেখতে গিয়ে. কারোর ক্ষেত্রে স্বদেশি বা বিদেশি প্রভাব লক্ষ করি ও বলি, বিদ্যাসাগর সংস্কৃতানুসারী, প্রমথ চৌধুরী ফরাসিস কিংবা সুধীন্দ্রনাথ জর্মন রীতির গদ্য লিখতেন। এই বলার পেছনে এঁদের পড়াশোনার পরিধি বা ভালো-লাগা সাহিত্যবোধ সক্রিয় ছিল। অথচ ফরাসি বা জর্মন রীতির গদ্য বাংলায় এলে

তা কতদূর বাংলা হবে, এ কথা ভাবি না। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারিতার লেবেল পাওয়ার কারণ তাঁর শৈলীতে তৎসম শব্দ বা সমাজের প্রভাব। কোনো সমালোচকই পাশাপাশি সংস্কৃত, ফরাসি, জর্মন গদ্যশৈলীর নমুনা দেখাননি।

স্বদেশি বা বিদেশি প্রভাব শৈলীতে মন্থরতা, সজীবতা বা তর্কের তীক্ষ্ণতা আনতে পারে। সেটাও লেখকমনে বহিরঙ্গ প্রভাব স্বীকার করা। এখানেও লেখকমনের বিশেষত্বটুকু অনুধাবনীয়। তাই অন্বয়, শব্দভাণ্ডার, প্রসঙ্গানুযায়ী ভাষার মানক লেখকের ক্ষেত্রে স্থির থাকে না, তা পালটে যায়। আগেই যদি গদ্যশৈলীর মানকগুলি বীপ্সাগণনা বা অন্বয়বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে, তাহলে বিচার দূর অস্ত্ হয়ে দাঁড়ায়। সৃষ্টির রাজ্যে সাহিত্যিক যেমন নিজের প্রতিটি পর্যায়কে অতিক্রম করেন, তেমনি গদ্যশৈলীও স্থির নয়, বিশেষ লেখকের ক্ষেত্রেও পরিবর্তমান। গদ্যের ইতিহাসে যদি অগ্রগতি-পরম্পরা ভাবি, তাহলে এখানেও তা ভাবতে হবে। তবু গদ্যশৈলী নিয়মহীন নয়। তাও লেখকের মন-বুদ্ধির ফসল, এটা মনে রাখা দরকার।

৩.৩ ❑ গদ্যশৈলীবিচার ও শৈলীবিজ্ঞান

শৈলীবিজ্ঞানের তিনটি মহলের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। একটি মহলে শৈলীবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের শাখা, সেখানে তা শৈলীভাষাবিজ্ঞান। দ্বিতীয় মহলে এটি হল সাহিত্যালোচনার উপশাখা বা সাহিত্যশৈলীবিজ্ঞান (লিটারারি স্টাইলিস্টিকস্)। আর শেষ মহলে এটি প্রয়োজনে ভাষাবিজ্ঞান ও প্রচলিত সমালোচনার সাহায্য নেয়, সেখানে এর নাম স্বাধীন বা সাধারণ শৈলীবিজ্ঞান (জেনারেল বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাইলিস্টিকস্)। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মহল প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যভাষার উপর বেশি জোর দেয়। কিন্তু প্রথমটি ভাষা-বিজ্ঞানের যুক্তিকে বেশি আশ্রয় করে। সাহিত্যের নানান বাঁকের কথা ভাবলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মহলই আমাদের উপকারে আসে। যুক্তির গদ্যের বিচারে শৈলীভাষাবিজ্ঞান (স্টাইলোলিংগুইস্টিকস্) বেশি সক্রিয় এবং উপযোগী। গদ্যের বিচারকালে নির্দেশমূলক (প্রেশক্রিপটিভ), বর্ণনামূলক (ডেসক্রিপটিভ) এবং ঐতিহাসিক-তুলনামূলক (হিস্টোরিক্যাল কম্পারেটিভ) ব্যাকরণ ছাড়াও বৈপরীত্য (কনট্রাস্টিভ) এবং রূপান্তরী-সঞ্জননী (ট্রান্সফর্মেশনাল জেনারেটিভ) ব্যাকরণেরও প্রয়োজন কম নয়। কিন্তু বাংলায় শেষ দুই জাতের ব্যাকরণ আজও পুরোপুরি না হওয়ায় আমাদের আলোচনা আংশিকতার লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পাবে। আবার প্রচল ব্যাকরণের পথেও লেখকের গদ্যভঙ্গির বিস্তৃত বর্ণনামূলক কাজ এখনও সর্বাংশে হয়নি। ব্যাকরণ এবং লিখিত গদ্যের আদর্শ, আবার তা থেকে লেখকের সরে-আসা (ডেভিয়েশন) মৌলিকতা নিয়ে কথা বলাই এই অংশের বিষয়।

৩.৪ ❑ ভাষাদর্শ (নর্ম) এবং সরে আসা (ডেভিয়েশন)

ভাষাদর্শ নিয়ে মতবিরোধের শেষ নেই। 'আদর্শ' বললেই কি ব্যাকরণগত রূপ কিংবা বিশেষ পর্বের লেখকদের, একজন প্রভাবশালী লেখকের কথা মনে আসে? যেমন, ফোর্ট উইলিয়মের ভাষাদর্শ, রামমোহনের ভাষাদর্শ থেকে বিদ্যাসাগর প্রমুখ সরে এসেছিলেন। এখানে ব্যাকরণগত রূপবদল পূর্বোক্তরা ঘটিয়েছেন। আবার তাদের প্রতিষ্ঠিত লেখ্য গদ্যের রূপ পরে পালটেছে। এভাবে আদর্শ ভেঙে আরেক আদর্শ গড়ে ওঠে। এই সরে-

আসা প্রচলিত লেখ্য ভাষার ধরন থেকে; কোনো আদর্শ, ব্যক্তিত্ব বা শৈলীবর্জিত কোনো পদ্ধতি থেকে নয়। আলালের ভাষা বা হুতোমী ভাষা কোনোক্রমেই রামমোহনী বা বিদ্যাসাগরী নয়। আবার বঙ্কিমী ভাষা থেকে সেই পর্বে অনেকেই মুক্তির চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ একটি সর্বজনীন ভাষাদর্শ থেকে অনেকে সরে আসে। এই সরে-আসা সবসময় ঘটে, এখনও হয়। অনেকে তো দেখি প্রতিষ্ঠিতের মতোই কলম ধরতে চান সজ্ঞানে। এভাবেই বঙ্কিমী গোষ্ঠী কিংবা রাবীন্দ্রিক মহল তৈরি হয়েছিল। এখানে লেখকরা আলাদা হতে চাইছেন না, বরং আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। এই আঁকড়ে থাকার স্বভাব বা সংসক্তি (কনফর্মিটি) লেখকক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। যেখানে তিনি ঠিকমতো অনুসরণে ব্যর্থ হন, সেখানে তার ব্যর্থতাগুলি অক্ষমতার পরিচায়ক। তাই শুধু আদর্শ থেকে সরে-আসা নয়, তাকে আঁকড়ে ধরার ব্যক্তিগত বা দলগত প্রয়াসও শৈলীর বৈচিত্র্য গড়ে তোলে।

৩.৫ ❑ ভাষার পরিবর্তক (ভ্যারিয়ান্ট) এবং উপলক্ষ্য (কনটেক্সট)

ভাষার পরিবর্তক এবং প্রসঙ্গকে দুভাবে দেখা যায় :

১. উপলক্ষ্য বর্গীকরণ (কনটেক্সচুয়াল ক্লাসিফিকেশন) : একটি কৃতির উপলক্ষ্য নির্দেশ করে আমরা সেখানে কী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা দেখতে পারি। যেমন উনিশ শতকের সাধারণ গদ্য এবং 'শকুন্তলা'। আবার উলটোভাবেও এটি করা যায়। যেমন, উনিশ শতকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের একটি বিশেষত্ব উদ্ধার করা এবং তাকে 'প্রাচীন' নামে চিহ্নিত করা। বাস্তবে আমরা দুটো পদ্ধতিই প্রয়োগ করে থাকি। আসলে উপলক্ষ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে হবে, কোন্‌গুলি শৈলীবিজ্ঞানের দিক থেকে সংগতিপূর্ণ, আর কোন্‌গুলি অতিরেক (রিডানডেন্ট)। এখানে সব মিলিয়ে সাধারণ যে রূপটি স্পষ্ট হয় তা হল আবরণ (এনভেলাপ), আর উপলক্ষ্য হল শৈলীবিজ্ঞানের সংগতিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ।

এংকভিস্ট, স্পেন্সার ও গ্রেগরি তাঁদের 'লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড স্টাইল' (১৯৬৪) রচনায় উপলক্ষ্যের আলোচনা এভাবে করতে চেয়েছেন :

১. যথার্থ ঐতিহাসিক ও ঔপভাষিক পরিবেশে কৃতির উপস্থাপনা

২. ক্ষেত্র, ধরন এবং সংপ্রেষণের সম্পর্ক দ্বারা কৃতির বিশ্লেষণ

(এখানে ক্ষেত্র হল বিষয়ের সঙ্গে আলোচনা পদ্ধতির সম্পর্ক। যেমন প্রেম-পত্রের সঙ্গে পরমাণুবিদ্যার আলোচনার পার্থক্য আছে। ধরন = মৌখিক ও লিখিত আলোচনার (ডিসকোর্স) পার্থক্য থেকে জাত ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈসাদৃশ্য। টেনর = লেখক/বক্তার সঙ্গে পাঠক/শ্রোতার ব্যক্তিগত বা নিয়ম-বাঁধা (ফর্মাল) সম্পর্ক পালটায়)

ভাষাবিজ্ঞানের মতোই এখানে সমলয়কালীন (সিনক্রনিক), বিসমলয়কালীন (ডায়াক্রনিক) বিবেচনার বদলে সর্বকালীন (প্যানক্রনিক) সমন্বয় কামনা করা উচিত।

আরেকটি প্রসঙ্গ হল শৈলীবদল (শিফট অব স্টাইল)। অনেক সময় লেখক উপলক্ষ্য বদল না করেই নানা শৈলীর আশ্রয় নিতে পারেন। যেমন একটি গতিশীল, জীবন্ত বর্ণনার পর স্থির অনুত্তেজিত বর্ণনা। এখানে পাঠকের দায়িত্ব হল উপলক্ষ্য ও ভাষার সম্পর্ক পরিবর্তন লক্ষ করা।

ক্রিস্ট্যাল এবং ডেভি শৈলীর আটটি মাত্রা ঠিক করেছেন। এজন্য কতকগুলি উপপ্রশ্নতালিকা তাঁরা স্থির করেছেন। এগুলি হাজির করলেই উত্তরে শৈলীর মাত্রা জানা যায়। উপপ্রশ্নগুলি এই ধরনের :

ক. রচনাপাঠে রচয়িতার পরিচয় জানা যায় কি? (ইন্ডিভিজুয়ালিটি)

খ. লেখক কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী? (রিজিওনাল ডায়ালেক্ট)

গ. লেখক কোন্ সমাজশ্রেণীর অন্তর্গত? (ক্লাস ডায়ালেক্ট)

ঘ. লেখক কোন্ সময়ে লিখেছেন এবং তাঁর বয়স? (টাইম)

ঙ. তাঁর পাঠকের কাছে প্রত্যাশা কী? সকলে তার বলার ধরনটা না তিনি কী বলছেন তাই দেখুক? (সিম্পল/কমপ্লেক্স ডিসকোর্স মিডিয়াম)

চ. কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে লেখাটি রচিত কি? (প্রভিন্স)

ছ. লেখক-পাঠকের সামাজিক সম্পর্ক কীভাবে রচনায় এসেছে? (স্ট্যাটাস)

ঝ. লেখকের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি? (মোডালিটি)

এর মধ্যে 'ঘ' মাত্রাটি শৈলীবিচারে একান্ত জরুরি নয়। কিন্তু গদ্যশৈলীর ইতিহাসলেখকের কাছে সময় বা কালের হিসেব ফেলনা নয়। লেখকের গদ্যকৃতি থেকে যদি উত্তর আসে না-এর, তাহলে সেই গদ্যশৈলী হবে অল্‌খ নিরঞ্জন জাতীয়। একে ক্রিস্টাল-ডেভি নাম দিয়েছেন 'কমন-কোর ল্যাংগুয়েজ'।

গদ্যশৈলী আলোচনায় একটি স্তর হল দুর্বোধ্যতা বা অবোধ্যতার স্তর। অনেক সময় লেখক এমন একটি শৈলী নির্বাচন করেন, যাকে প্রচল গদ্যবোধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কেন, তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। কিন্তু কমলকুমার মজুমদার কিংবা অমিয়ভূষণ মজুমদার (আংশিকভাবে) একেবারে আলাদা গদ্যশৈলীতে লিখেছেন। মাঝে মাঝে একে মনে হয় সন্ধ্যাভাষার মতো। লেখক যেন পরিচিত-অপরিচিত শব্দ, অন্বয়বিন্যাসে এক আলো-আঁধারী রাজ্য গড়ে তুলতে চান। পাঠক চেষ্টা করেও প্রবেশের পথে শতেক বাধা দেখে একে গুহ্য বা গোপন ভাষা (এস্টোরিক ল্যাংগুয়েজ) রূপে চিহ্নিত করতে চান। এমনভাবে লেখকেরা স্বভাববৈশিষ্ট্য প্রকাশ করলেন কেন? সংপ্রেষণকামনা এখানে কি অপ্রধান?

৩.৬ ❑ গদ্যের শৈলীবিচারের মানক

গদ্যের শৈলীবিচার করতে গিয়ে কতকগুলি মানক স্থির করা প্রয়োজন। এগুলি হল—

১. বাক্যের প্রকৃতি

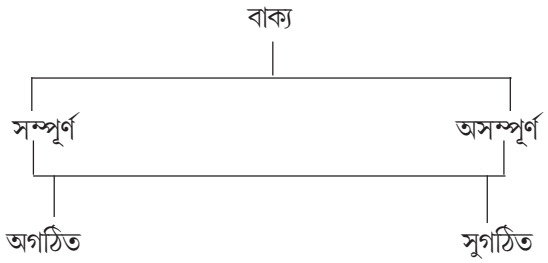

২. উপলক্ষ্যের সুসংগতি (কনটেক্সচুয়াল কোহেশন) : একই উপলক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য যা বাক্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায়।

৩. শাব্দিক সুসংগতি (লেক্সিকাল কোহেশন) : একই জাতের শব্দভাণ্ডারের প্রয়োগ একটা ঐক্যভাব জাগিয়ে তোলে।

৪. উপবাক্যের সংযোগ (ক্লজাল লিংকজে) : কিছু কৌশল যা দিয়ে বাক্য, উপবাক্য কিংবা কৃতিতে বাক্যের মিশ্রণ-প্রক্রিয়া বোঝানো হয়। 'বাক্য-উপবাক্যের সম্পর্ক ব্যাকরণে থাকলেও কৃতির সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক আলোচনার দাবি করে। লুই. টি. মিলিচ তাঁর 'স্টাইলিস্টস অন স্টাইল : আ হ্যান্ডবুক উইথ সিলেকশন ফর অ্যানালিসিস'-এ বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যোগকে আটটি মৌলিক ও যৌক্তিকভাবে দেখিয়েছেন :

ক. অতিরিক্ত (অ্যাডিটিভ) : একটি বিবৃতি যার সঙ্গে আগের বিবৃতির যোগ নেই (এবং)

খ. সূচনা (ইনট্রুডাকশন) : অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যের গড়ন

গ. বৈপরীত্যসূচক (অ্যাডভার্সেটিভ) : একটি বিবৃতি যা যুক্তির মোড় ফেরায় (কিন্তু)

ঘ. পরিবর্তিত (অলটারনেটিভ) : আগের বিবৃতির বদলে (বা, কিংবা)

ঙ. ব্যাখ্যামূলক (এক্সপ্লেনেটরি) : আগের বিবৃতি নিয়ে আবার মন্তব্য, সংজ্ঞাদান বা বিশদীকরণ (তা হল)

চ. উদাহরণমূলক (ইলাসট্রেটিভ) : উদাহরণ বা ব্যাখ্যা (যেমন, উদাহরণস্বরূপ)

ছ. সূত্রমূলক (ইলেটিভ) : উপসংহার ধরনের (সুতরাং)

জ. কারণাত্মক (কজাল) : আগের উপসংহারের হেতু (কারণ, জন্য)

৩.৭ ❑ উদাহরণমালা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা'

"ভব-ব্যাধি-প্রমোচক জ্ঞানদয়াসিন্ধু বৈদ্যরাজ বোধিদ্রুমমূলে সম্বোধিলাভের সময় ভব-ব্যাধির হেতুস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সেই তত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।"

কিংবা, "মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণপাত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক ছুটিতে থাকে, এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তাহার উদ্‌ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ অচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধিলাভ করে।"

এই দুটি অংশ পড়ে পাঠকের ধারণা হয় যে, এগুলি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গদ্য-নমুনা। এই কালগত গদ্যের নমুনা প্রকৃতপক্ষে একটি সাধারণীকরণ—এটি লেখকের বিশেষত্ব প্রমাণ করে না। আমাদের তাই লেখক সম্বন্ধে স্পষ্টতা আসে না—শুধু রচনাকাল প্রমাণিত হয়। কিন্তু শৈলী বলতে যে স্বাতন্ত্র্যের কথা বুঝি, তা জানার জন্য আরও কয়েকটি নমুনার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত দুটি অংশের লেখক হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দুটিরই রচনাকাল উনিশ শতকের শেষাংশে। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যশৈলীবিচারে তাঁর সব কটি প্রবন্ধের বই আলোচনায় আনছি না। শুধুমাত্র 'জিজ্ঞাসা' বইটির

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ব্যবহৃত গদ্যশৈলীই আমাদের আলোচ্য। আবার 'জিজ্ঞাসা'রও সব প্রবন্ধের আলোচনা না করে নির্বাচন করা হয়েছে। এই নির্বাচিত লেখায় যদি তাঁর বিশেষ শৈলী চেনা যায়, তাহলেই এর সাহায্যে অন্যগুলির বিশেষত্ব বোঝা সম্ভব হবে।

১. "জীবন দুঃখময়; কেননা, দুঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও আশা। আবার জীবন দুঃখময়; সেইজন্য সুখের আবশ্যকতা। নইলে দুঃখের ভারে জীবন টিঁকিত না, নইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত।"

(সৌন্দর্যতত্ত্ব)

এখানে প্রথম বক্তব্যটি সুনিশ্চিত করতেই বাকি বাক্যগুলি এসেছে। অর্থাৎ, এগুলিকে মূল বক্তব্যের সাহায্যকারী বাক্য বলতে পারি। কিন্তু সাহায্যের প্রকারভেদ আছে। যেমন, প্রথম অধিবাক্যটি (কেননা....আশা) কারণাত্মক। দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমটির বিরোধী না হলেও 'সুখের আবশ্যকতা' অংশটিতে একটা আপাতবাক্যের (নইলে) সাহায্য নেওয়া হয়েছে। লেখক বৈপরীত্যের প্রশ্নটিকে সমাধানে পৌঁছে দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই গদ্যভঙ্গিতে ক্রিয়ার স্বল্পতা চোখে পড়ে। আবার বাকি অংশের সাধু গদ্যের পাশে 'টিঁকিত না' একটা চলিত ভঙ্গি এনেছে। এখানে 'টিঁকত'র জায়গায় 'টিঁকিত' আছে বলেই তা সাধু হয়ে যায় না।

২. "যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মা। কিন্তু ইহা বলিলেই মহাকোলাহল উঠিবে। রামানুজস্বামী হইতে বার্কলি পর্যন্ত সকলেই সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিবেন। কেহ লাঠি বাহির করিবে, কেহ ভ্রুকুটি করিবেন, কেহ উপহাসের হাসি হাসিবেন এবং সকলেই গর্জন করিবেন। বলিবেন, একটি বাতুলের প্রলাপ; এই সংকীর্ণ সসীম পরিমিত কর্মপাশবদ্ধ সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান দুর্বল ক্ষীণ জীবের এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সে জগৎকর্তৃত্ব জগৎবিধাতৃত্ব সর্বশক্তিমত্তা চায়।....হা দগ্ধোহস্মি!" (মুক্তি)

প্রথমে একটি গুরুতর বিষয়ের সমাধান টেনেছেন। বাকিগুলিতে তার প্রতিক্রিয়া যেভাবে সাজিয়েছেন, তার মধ্যে কৌতুকসৃষ্টির পরিচয় পাই। এটি গদ্যের বিশদীকরণের দৃষ্টান্ত। আবার জীবের আগে সাতটি গম্ভীর বিশেষণ যে আসলে উচ্চ হাসির ভূমিকা, তা বোঝা অসম্ভব নয়। তার্কিকের যোদ্ধারূপ (যুক্তির অভাবে), ভ্রুকুটি (জ্ঞানবৃদ্ধের স্বভাব), উপহাসের হাসি (তাচ্ছিল্যভাবে)—লেখকের প্রাপ্য। কিন্তু সকলের গর্জনের মধ্যে একটি হাসির ভাব আছে। আবার একটি সংলাপের ধরন আড়ালে নেই।

৩. "উজ্জয়িনীর রাজপথে তামাসা উপস্থিত হইলে কালিদাসের নয়ন তামাসা ফেলিয়া সৌধবাতায়নের প্রতি ঊর্ধ্বমুখে ধাতিব হইত; স্নানান্তে আর্দ্রবসনা যুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত; এবং তাহার মানস লোচন জলদময়ী তিরস্করিণীর আবরণ ভিন্ন করিয়া অংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতা কিম্পুরুষাঙ্গনার নগ্ন দেহের দিকে বিবর্তিত হইত।" (সৌন্দর্যতত্ত্ব)

প্রথম উদাহরণের পাশে এটি রাখলে লেখকের শৈলীর ভিন্নগামিতা লক্ষ করা যায়। তিনটি বাক্য একই বাক্যবন্ধে লগ্নীকৃত হলেও তিনটি উদাহরণ জাতীয়। সংস্কৃত কাব্যপাঠের ফল রামেন্দ্রসুন্দর সচেতনভাবে প্রয়োগ করলেও যেভাবে বক্তব্যটিকে দুঃসাহসিক করেছেন, তা তাঁর মনের সংস্কারমুক্তির পরিচায়ক। কেউ এটিকে সংস্কৃতানুসারী বলতে পারেন। কিন্তু অন্তরঙ্গে এই ছবিগুলি শ্লেষবিদ্ধ। মানুষের রুচির তফাৎ এবং সৌন্দর্যবোধকে বোঝাতে গিয়ে এগুলি এসেছে।

৪. "আমার অনুভূতি ক্রমেই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি। অর্থাৎ প্রকৃতিহস্তে খড়্গাঘাতের আশঙ্কা। এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ নহে, খড়্গাঘাতের আশঙ্কা যাহার মোটেই নাই, সে জীবনসমরে আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা নাই।" (সৌন্দর্যতত্ত্ব)

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই জাতীয় বাক্যবিন্যাস। প্রথম বাক্যে একটি বক্তব্য। দ্বিতীয় বাক্যে প্রথম বাক্যের একটি শব্দের (অনুভূতি) বিশেষ সংজ্ঞাদান। তৃতীয় বাক্যটি দ্বিতীয় বাক্যের শেষাংশ নিয়ে সূচিত—পুনর্ব্যাখ্যান। চতুর্থ বাক্যটিতে অভাবের পরিণামে আঁকা হয়েছে। বাক্যগুলির গড়ন হল :

রেখাচিত্র ১ : বাক্যাবলির গড়ন

আবার 'অনুভূতি' শব্দটির বিচিত্র গতিও লক্ষণীয় :

১ক—২ক—৩ক—৪ক

রেখাচিত্র ২ : বিশেষ শব্দের গতি

এটি রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ গদ্যকৌশল যার সাহায্যে তিনি উপবাক্য বা বাক্যের সংগতি আনেন। এই গদ্যকৌশল অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ মনের রচনা। কিন্তু যুক্তির জালের মধ্যে কৌতুক, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা পরিবেশিত। তাঁর গদ্যে ব্যঙ্গের তীব্র জ্বালার অভাব নেই। যেমন,—

৫. "মানবশিশুর 'মিউলিং অ্যান্ড পাকিং ইন দা নার্সেস আর্মস'—ধাইমার কোলে কেঁউমেউ করে—এই অবস্থায় অভিনয়ের আরম্ভ এবং বার্দ্ধক্যে 'সাঁ আইজ, সাঁ টীথ'—কানা চোখ, পড়া দাঁত অবস্থায় অভিনয়ের যবনিকাপাত; সেই বৃত্তান্ত যাহারা পড়িয়াছেন, তাহারা অন্ততঃ কবিত্বের জন্য শেক্সপীয়রকে বুদ্ধদেবের অনেক উচ্চে বসাইবেন।" (প্রতীত্যসমুৎপাদ)

সাধারণ পরিবর্ত-বাক্য রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে একটি বিশেষ গদ্যভঙ্গিতে পরিণত হয়েছে। যেমন,

৬. "সে ব্যক্তি না হয় নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পত্নীর কথা কে জানে? অথবা তাহার দোষ না থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল; অথবা পিতামহের দোষ ছিল; এ জন্মে দোষ না থাক, পূর্বজন্মে দোষ ছিল না, তাহা কে বলিল?" (অমঙ্গলের উৎপত্তি)

এখানে গদ্যভঙ্গিতে প্রত্যাশিত জটিলতা কিংবা কথনের অপূর্বতা তৈরি হয়েছে। 'অথবা' যোগে পরিবর্ত-বাক্যগুলি একটি আরোহভাব এনেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচল সিংহ-মেষশাবকের গল্পটিকে মনে পড়ে লেখার গুণে। অবশ্য পরিবর্ত-বাক্যগুলিতে প্রশ্নবাক্য সাহায্য করেছে।

গদ্যশৈলীর সব কটি বৈশিষ্ট্য যে বাক্যনির্ভর, এ কথা আমরা বলি না। যেমন, রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যে একটা সূত্রানুসারী (পয়েন্টেড) বক্তব্য পেশের বহিরঙ্গ রূপ দেখতে পাই। 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে সব কিছু বলার পর তিনি আটটি সূত্র সাজিয়েছেন। প্রসঙ্গানুযায়ী গদ্যের বহতা রূপকে সমাপ্তিতে সংক্ষিপ্ত করার এ এক কৌশল। যেহেতু প্রায় প্রবন্ধে এই ধরন গৃহীত হয়েছে, তাই এটিকে তাঁর গদ্যশিল্পের এক বিশেষ চেহারা বলা চলে।

পাঠকের সঙ্গে আলাপন ছোটোগল্প-উপন্যাসের একটি বিশেষ পদ্ধতি। প্রবন্ধে এর বিশেষ পরিচয় পাই না। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যে এই লেখক-পাঠক যোগাযোগ লক্ষ করি। প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি লেখেন :

৭. "মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকেই বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।"

সাধারণভাবে প্রবন্ধে লেখক আড়ালে থাকেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে এই আড়াল-আবডাল কম থাকে। রামেন্দ্রসুন্দর এই আড়াল রাখতে চাননি। প্রবন্ধের নৈর্ব্যক্তিকতার এতে হানি হল, না লেখক-পাঠক সম্পর্ক গভীর হল, তা বিবেচনার বিষয়।

এই বিশেষ গদ্যগুণকে আমরা তাঁর প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্য হিসাবেই দেখব। গদ্যে এই কৌশল মাঝে মাঝে অভিনবত্ব এনেছে, বিষয়ের জটিলতা থেকে সহজ মুক্তির উপায় খুঁজেছেন পাঠককে আপন করে নিয়ে :

৮. "সেই আমি কে? বলিতে পারি না। যতে বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—বাক্য সেখানে গিয়া প্রতিহত হয়; মনও সেখানে নিবৃত্ত হয়,—আমি আছি; আমি চিৎ—আমি চৈতন্যস্বরূপ; আর-আর—নিতান্ত না ছাড়—আমি আনন্দ—আমি আনন্দরূপ—আমি আছি, এই আমার আনন্দ।"

লেখক যেন আমিত্বের বিশ্লেষণে আপাত-অসমর্থ। সংস্কৃত গড়নের সেই বিশ্লেষণের মধ্যে চলতি বাংলার কৌতুকের সুরও যুক্ত হয়েছে। প্রথমটি বঙ্কিমী কৌশল হলেও দ্বিতীয় উদাহরণে খণ্ড বাক্যের বিন্যাস, যতিচিহ্নের প্রাচুর্য, 'নিতান্ত না ছাড়' বাক্যাংশে পাঠকের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা গদ্যমাধ্যমেই সাধিত হয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক প্রবন্ধাবলিতে যেমনি যুক্তির গাঢ়তা অথচ সরসতা লক্ষ করি, তেমনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির গদ্যভঙ্গিও আকর্ষণীয়। বিজ্ঞানের বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার উত্তাপতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে তাঁর আলোচনার সুর একেবারে ঘরোয়া আলাপের মতো। বিজ্ঞানের বিষয়কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করতে গিয়ে তিনি এখানে চলতি সংলাপের ঢংকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। এখানে সম্বোধন বাক্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি নেওয়া হয়েছে :

৯. "তুমি বৃহস্পতি, বিশাল কায় লইয়া বহুদূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও না। ...আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকেও একেবারে আজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক দিয়াও একটু ঘুরিয়া চলিতে হইবে।...নেপচুন, তুমি বহুদূরে থাকিয়া এতকাল লুকাইয়াছিলে; বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।" (নিয়মের রাজত্ব)

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের গদ্যে এই সহজ আলাপন ভঙ্গিতে সংস্কৃত শব্দের বিন্যাস আমাদের বিরক্তি ঘটায় না। কেননা আড়ালের বা প্রত্যক্ষ লৌকিক সুর আমাদের মন টানে—আরও পড়তে, জানতে ইচ্ছা করে। জ্ঞানবিষয়ের এই আকর্ষণকারী গদ্যভঙ্গি রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ ব্যাপার।

কখনও কখনও তিনি উদাহরণ আনতে গিয়ে শব্দাবলির সহজতম দেশি রূপকে স্থান দেন :

১০. "রঙ্‌টা হইল মানসিক ব্যাপার; ঘাস হইতে রঙ আসে না, ঘাস হইতে আসে ধাক্কা—বর্ণহীন ঘ্রাণহীন নীরব ধাক্কা—পিঠে কিল দিলে যেমন বর্ণহীন ঘ্রাণহীন ধাক্কা হয়, ঠিক তেমনিই ধাক্কা। এই ধাক্কা শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে যায়, সেখানেও সেই ধাক্কাই থাকে; কিন্তু ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সেই বিকার—সেই অনুভূতি—রঙের অনুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়।" (বর্ণতত্ত্ব)

'ধাক্কা' শব্দটি সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে অভিঘাত বোঝানোর জন্য। আবার এর প্রকৃতি বোঝানোর জন্য 'পিঠে কিল মারা'র মতো লৌকিক বাক্যাংশ এসেছে। পদার্থবিজ্ঞানের বর্ণতত্ত্ব নিয়ে যখন পাঠ্যপুস্তক লেখকরা হিমসিম খান, তখন রামেন্দ্রসুন্দর তাকে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ করে জীবন্ত করে তোলেন। এই জীবন্ত ভাষা নেওয়ার কারণ সংপ্রেষণ কামনা।

পরিভাষা কেমন হবে, এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কেউ চান একে তৎসম শব্দভাণ্ডারনির্ভর করতে, কেউ চান দেশি রূপে তদ্ভবরূপে পরিভাষিত করতে, আবার কেউ কেউ শব্দটিকে স্বরূপে কিংবা লিপ্যন্তরে রাখতে চান। রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত ভালো জানলেও প্রথম দলের গোঁড়ামীতে সায় দেননি। আবার জোর করে পরিভাষার বাংলা রূপ এনে যে কিম্ভূত অবস্থা, তাকেও মানেনি। বরং যে শব্দটি কলমের ডগায় স্বাভাবিকভাবে আসে, তাকেই স্থান দিয়েছেন (ইকুয়াল, ইকুয়াভেলেন্ট, হিট, মেকানিক্যাল ইংরেজি অক্ষরে)। আবার 'মাস' শব্দের বাংলা 'ভর' না করে জানিয়েছেন—

১১. "বাঙ্গালা ভাষার ঐ মাস্ শব্দের ভাল প্রতিশব্দ নেই; গ্রন্থলেখকরা অনুবাদে যাঁহার যে শব্দ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। আমি একটা নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব; মাস (ইংরেজীতে) অর্থে বস্তু শব্দ প্রয়োগ করিব।....এই বস্তু শব্দকেই জড়ত্ব বিজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।" (বিজ্ঞানে পুতুলপূজা)

বাংলায় প্রতিশব্দ নির্মাণের নৈরাজ্য যে রামেন্দ্রসুন্দরকে পীড়িত করেছিল, এই কথা আমরা আলোচনা থেকে বুঝতে পারি।

১২. রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে সংস্কৃতের সংখ্যা কম না হলেও একান্ত তদ্ভব বা দেশি শব্দের প্রয়োগে তিনি উদার ছিলেন। যেমন, হটমট করে ছোটা, দাঁতের ভাঁটা, ধাক্কা খাওয়া, মুড়ি-মিছরির এক দর, সওয়ার টলেন, চোতা কাগজ, খামখেয়ালি, গোলে পড়া, দড়ি-কলসী যোগান, উড়ে যাওয়া, সাহসে কুলান, ওলট-পালট করা, জল উঁচু স্বীকার করা, ফাজিল অঙ্ক, লাঠি মারা, তামাসা, গায়ে গা, ছাঁটিয়া কাটিয়া, ছাঁচে ঢালা, খট্‌কা, চেপে ধরা, এলোমেলো (পাশে আবার বিশৃঙ্খল), আঁক-কষা, গালি দেওয়া, খাপছাড়া, নাকি সুর, ভোঁতা তলোয়ার, খুঁটিনাটি, ভান করা, লুকোচুরি খেলা, আঁকাবাঁকা, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো, মতলব আঁটা, আঁধ পোয়া, হজম করা, এক পা চলা, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, মজুরি পাওয়া, প্রাণ গেল, দেওয়াল পড়া, হুলস্থুল ঘটান, হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, মাঝামাঝি, মাপকাঠি, ঝুটা, সরিয়ে ফেলা, বাছিয়া লওয়া, পথ ঘোরা, ভাগ কম পড়া, বাছবিচার না করা, মাথার উপর মাথা, কাটাকাটি, ঢিল ছোঁড়া, ঠোকাঠুকি, কাছাকাছি, ঝাড়ের কলম, পিঠে পড়া, বাঁধাবাঁধি, মোটা লাভ, একঘেয়ে, এক নিঃশ্বাসে মীমাংসা করা, বাঁশের দোলা (পরে শয়ান শবমূর্তি), কথায় কথায়, বাড়াইয়া বলা, কানা চোখ, পড়া দাঁত, গা ছমছম করা, বাগ্‌বিতণ্ডা, থেঁতলান, গুঁড়া করা, পোড়ান, ধব্ করিয়া, ভুল-চুক, কারবার করা, ষোল আনা, পেটুক, মাতাল, লাঙ্গল চষা, হাওয়ার উপর বাড়ী গাঁথা, মরিচা-ধরা, মুখস্থ করা, মোলায়েম, বাহবা, 'বানরে সঙ্গীত গায়', মরা মানুষ, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, জজিয়তি, হেলে থাকা, ঢুকিয়ে দেওয়া, হাত পোড়ান, হেঁয়ালি, তলাইয়া দেখা, মাথা খোঁড়া, প্যাঁক প্যাঁক করা, ছোঁ দেওয়া, মাথা খাটান, কিলবিল, গলা টেপা, আফিমের গুলি, ভেংচান, লেজ গজান, ওষুধ গেলা, বোঁটা (আগেবৃন্ত আছে), ধোঁকা, অল্প খাওয়া, মন গড়া, খরিদ করা, পাগলা গারদ, ফ্যাঁস করা, কচকচি, মুটেভাড়া, একভরি, সাবেক।

এই একশোর বেশি চলিত শব্দ, ক্রিয়া, বাক্যাংশ, প্রবাদবাক্য তিনি আত্মার অবিনাশিতা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, বিজ্ঞানে পুতুলপূজা ইত্যাদি নানা আলোচনায় ব্যবহার করেছেন। তত্ত্বকে জেনে তাকে প্রয়োগ করার জন্য বা জানানোর জন্য যে গদ্যশৈলী ব্যবহৃত, তার সংপ্রেষণে সহজতা এনে দিয়েছে গদ্যাংশগুলি।

১৩. সাধারণভাবে রামেন্দ্রসুন্দরে সংক্ষিপ্ত বাক্যের সংখ্যা বেশি। যেগুলি আমাদের মনে দীর্ঘ বাক্যের আভাস আনে, সেগুলিও অনেক বাক্যের যোগফল, সেমিকোলনে জোড়া। লেখক পূর্ণযতির চেয়ে সেমিকোলনে, ড্যাশচিহ্নে বেশি স্বস্তি পেয়েছেন। বাক্যের গতি আনার জন্য কিংবা যুক্তির শিকল বা প্রবাহ বোঝাবার জন্য পূর্ণযতির বিরাম প্রত্যাশিত নয়। এছাড়া নানান ধরনের ছেদচিহ্ন তাঁর গদ্যশৈলীতে অবিরত সক্রিয় থেকেছেন।

১৪. চলিত বা দেশি শব্দের মতো তৎসম শব্দগুলির অভিধা ও ব্যঞ্জনার্থপ্রয়োগে রামেন্দ্রসুন্দর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু সাধু গদ্যরীতির প্রাণহীনতার জগতে সংপ্রেষণের সহজতা সঞ্চারের জন্যই তিনি এক মধ্যম শৈলী বেছেছিলেন—যা সাধুও নয়, আবার একেবারে চলিত নয়। এরই সঙ্গে তর্ক-আলোচনার ভঙ্গি ভাষাকে সজীবতা, সরসতা দান করেছে।

শৈলীবিচারে এই চোদ্দটি বৈশিষ্ট্য একটি গদ্যশৈলী বা তার স্রষ্টার পরিচয়কে উদ্ভাসিত করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর নিজে যেমন বিষয় অনুসারে চলতি বাক্‌ভঙ্গির মেজাজ সাধু গদ্যে আনেন, তেমনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে দার্শনিক প্রবন্ধের শৈলীপার্থক্যও আছে। দার্শনিক প্রবন্ধের যুক্তিতে বোনা গদ্য সরসতার শক্তিতে কখনও নীরস তত্ত্বে পৌঁছায়নি। সেখানে পাঠকের জ্ঞানস্পৃহাকে সম্মান জানিয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের গদ্য বলতে যে আঙ্কিক তথ্য সমাহার বুঝি, তার ধারণা তিনি ভেঙেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই ধরনের অভিনব কর্মে অপর দুই সহযোগী ছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের তত্ত্বস্তূপকে আলাপচারিতার গুণে নূতন মাত্রা দিয়েছিলেন। তিনি এখানেও সতর্ক ছিলেন যাতে সরসতার মোহ যুক্তি, বিষয়ের বোধ ছাড়িয়ে না যায়। অনেক সময় আলাপন বিষয়কে লঘু করে, বিপর্যস্ত করে। রামেন্দ্রসুন্দর সেই সীমা জানতেন। ইংরেজি বা বিদেশি শব্দের বঙ্গানুবাদ করতে পিছপা হননি। আবার জোর করে পরিভাষা করার তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন।

এই অধ্যায়টি তাঁর বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক প্রবন্ধেই সীমিত থেকেছে। তাঁর সাহিত্যসমালোচনার গদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কেননা সৃষ্টির গদ্যের ব্যাখ্যা এখানে সমালোচনায় নূতন মানক যোগ করে। চোদ্দটি শৈলীবৈশিষ্ট্য পরপর সাজানো হয়েছে, এমন নয়। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' বইটি এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিন্যাস-সমাহার, এটা মানতে বাধা নেই। রামেন্দ্রসুন্দর যে নিয়মের রাজত্ব দেখেছিলেন, এটি সেই পথে চলারই আনন্দ। লেখকের মনের কামারশালার সংবাদ যে পরিবেশন করা যায় যুক্তির গদ্যের বিশ্লেষণে, এখানে সেই চেষ্টা করা হল।

❑ উৎসগ্রন্থ ও প্রবন্ধ

বাংলা

১. অজরচন্দ্র সরকার (১৯৪৯), বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. অপূর্বকুমার রায় (১৯৭৬), উনিশ শতকের বংলা গদ্যসাহিত্য : ইংরাজি প্রভাব, জিজ্ঞাসা।

৩-৪. আশিসকুমার দে (১৯৮১), রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসা : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (পত্রিকা) বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪।

(১৯৮৭), ঋজুতা না গদ্যের উৎকট গতি : সুধীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলী, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য', পুস্তক বিপণি।

৫—৬. নবেন্দু সেন (১৯৭১), গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা।

(১৯৮৮), বাংলা গদ্য : স্টাইলিসটিকস্, সাহিত্যপ্রকাশ।

৭. পবিত্র সরকার (১৯৮৫), গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।

৮. মনোমোহন ঘোষ (১৯৪২), বাংলা গদ্যের চার যুগ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং।

৯. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৬০), বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, শতাব্দী গ্রন্থভবন।

১০. সজনীকান্ত দাস (১৯৬২), বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, মিত্রালয়।

১১. সুকুমার সেন (১৯৬৭, ৪র্থ সং), বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ন পাবলিশার্স কলকাতা।

ইংরেজি

১. আব্রামস, এম. এইচ. (১৯৭৮), এ গ্লসারি অব্ লিটারারি টার্মস, ম্যাকমিলান সংস্করণ।

২. ক্রিস্ট্যাল, ডেভিড অ্যান্ড ডেভি, ডেরেক (১৯৬৯), ইনভেস্টিগেটিং ইংলিশ স্টাইল, ইন্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস ব্লুমিংটন।

৩. মিলিচ, লুই টি (১৯৩৯), স্টাইলিস্টস অন স্টাইল : আ হ্যান্ডবুক উইথ সিলেকশন ফর অ্যানালিসিস, চার্লস স্ক্রিবনার সন্স, নিউ ইয়র্ক।